অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আলামত এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ।।

১.

দম আটকে বসেছিলেন বাংলাদেশের মানুষ পুরো গ্লোব জুড়ে। কী হয় ! কী হয়!! ছয় এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের লং মার্চ্চ নিয়ে সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আমরা প্রবাসীরা টিভি ইনটারনেট খুলে বসে আছি। দেশে প্রথমবারের মত ছুটির দিনে হরতাল দিয়েও ওদের সমাবেশ-লং মার্চ বন্ধ করা গেলো না। ওদের লম্ফঝম্ফতে হতভম্ব হয়ে সরকারসহ সবাই একবারে ”লা জবাব’ হয়ে রইলো। সবই বোঝা গেলো শুধু বোঝা গেলো না সরকার কেন এতো নমনীয় হয়ে থাকলো। ভয় পেয়েছিলো? ঘাবড়ে গিয়েছিলো? তাই যদি না হবে তাহলে লং-মার্চ্চের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের মন্ত্রীকে চট্টগ্রামের হেফাজতে ইসলামের নেতার কাছে দেন দরবার করতে পাঠিয়েছিলো কেন? কোন কাজ তো হয়নি। ওরা লং মার্চ্চ - সমাবেশ করেই ছাড়লো। মনে হলো যেন সরকারকে একটু দয়াও করলো ওরা। মনে হলো যেন বললো - ’বেশী কিছুতো করলাম না -ভাংচুর হত্যা-টত্যা তেমন কিছুই করলাম না - এই শাহরিয়ার কবীরকে একটা দাবড়ানি দিলাম আর ইটিভি-র ওই মহিলা সাংবাদিকটাকে একটু ’সাইজ’ করে দেখিয়ে দিলাম।

তেরো দফা মধ্যযুগীয় দাবি দিয়েছে এবং আশ্চর্য লাগে সরকার বলছে সে দাবিগুলো বিবেচনা করে দেখবে কী করা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ওদের ধন্যবাদ দিয়ে যেন বিরাট একটা দম ছাড়লেন। বাব্বা বাঁচা গেলো। সুযোগ থাকলে বোধহয় ওদের নেতাকে সালামও করে আসতেন। মাহবুবুল আলম হানিফ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুরে কোরাস গাইলেন আরো অনেককে নিয়ে। দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন। আবার একদিন পরেই বললেন ওগুলো সব মধ্যযুগীয় দাবি ওগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। উপদেষ্টা মোহাম্মদ নাসিম একবার বললেন - হেফাজতে ইসলামের লক্ষ্য ছিলো সরকার উৎখাত করা পরে দেখলাম ওটা সংশোধন করে বলছেন -হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে ব্যবহার করে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা ছিলো বিএনপি-জামায়াতের। সব যেন বেসামাল হয়ে পড়েছে। কী বলতে কী বলছে নিজেরাও বুঝছে না।

কিন্তু কেন? সবকিছু তো প্রায় গুছিয়ে আনা হয়েছিলো। এবং যুদ্ধপরাধীদের বিচারে জামায়াতকে রুখতে গণজাগরণ মঞ্চ করে তরুণ প্রজন্ম যে বিশাল শক্তি সাহস আর পটভূমি তৈরী করে দিয়েছিলো, সারা দুনিয়া এ সাহসী সরকারকে যে সমর্থন জুগিয়ে ছিলো এ সবই যেন ঠুনকো হয়ে গেলো হেফাজতে ইসলামের কারণে। বন্দুক তাক করার আগেই যেন সারেন্ডার। আর ব্লগারদের বেলায় যা ঘটলো তা কেবল এক কথাতেই বলা যায় - ’যার জন্য করলাম চুরি সেই বললো চোর’।

কোন ধর্মকে নিয়ে মশকরা অবমাননা আমি কিছুতেই মেনে নেবো না। আর আমার ধর্ম আর নবীজীকে নিয়ে কেউ অবমাননাকর কিছু করলে/বললে সে আমার আজীবনের শত্রু তাকে আমি ছেড়ে দেবো না। সে যেই হোক তার বিচার হতেই হবে। তাই বলে হেফাজতে ইসলামকে খুশী

করবার জন্য নয়। তাদের দেয়া লিষ্ট দেখে নয়। কিছু প্রমাণ কী পাওয়া গেলো ব্লগারদের ব্যাপারে? সরকার কেন মুখ খুলছে না?

হেফাজতে ইসলামকে আশকারা দিয়ে সরকার যদি ভেবে থাকে জামায়াত বিএনপিকে দমন করা যাবে তাহলে খুব ভুল হচ্ছে। তাহলে সেই উপদেষ্টা নাসিমের কথায় ফিরে আসতে হয় হেফাজতে ইসলাম নেপথ্যে কার এজেন্ডা পূরণ করছে? সরকার কীভাবে নিশ্চিত হলো - যে এরা ঢোড়া সাপ ফণা তুললেও ছোবল দেবে না? আবার ছোবল দিলেও তাতে বিষ নেই!

এই যখন অবস্থা তখন বিএনপির সব প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতাদের জেলে পুরে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা কেন? হেফাজতে ইসলাম কী দেখিয়ে দেয়নি ওরা চাইলে জামায়াত- বিএনপি ছাড়াই পারবে সরকারকে কাবু করতে। এখনই ওদের রুখতে হবে। কোন তোষণ নয়।

আমার তো মনে হয় সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগ ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে পড়ছে। এই যে এতো বড় বড় একেকটা ঝড় ঝাপটা যাচ্ছে কই সাংগঠনিকভাবে তো ময়দানে তেমন কাওকে চোখে পড়ে না। ঘুরে ফিরে সেই মাহবুবুল আলম হানিফ, মোহম্মদ নাসিম আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর সব গেলো কোথায়? অবশ্য মফঃস্বলে কোন কোন জায়গায় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা টুকটাক লড়েছে। প্রাণও দিয়েছে। যখন ওরা লড়ছে প্রাণ দিচ্ছে তখন যারা ওদের মারছে তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে(?) সমাবেশ হরতাল করার জন্য ধন্যবাদও দিচ্ছে সরকার। চমৎকার। বড়ই চমৎকার।

সরকারকে ঝেড়ে কাশতে হবে। তার অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের এই সরকার এখনো 'রাজনৈতিক এতিম' হয়ে যায়নি। এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষরা সুসংহত। এখনো গণজাগরণের মানুষরা একতাবদ্ধ - এখনো সবাই লড়তে প্রস্তুত। কেবল অপেক্ষা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নির্দেশনার। নাচতে নেমে ঘোমটা টানার আর সুযোগ নেই। খেলাফতদের সাথে চুক্তি নামায় সই করে, ইনকিলাব অফিসে গিয়ে শেকহ্যান্ড করে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয়নি। তেমনি হেফাজতে ইসলামকে তোষণ করে আত্মঘাত ছাড়া আর কিছুই হবে না। শাহবাগ থেকে শুরু করে গাটা দেশের এ তরুণরাই গত নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এই সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে। হতাশায় এই প্রজন্ম মুখ ফিরিয়ে নিলে আর নির্বাচনে জেতা হবে না - হবে না তেমনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা - বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা কী তার ইঙ্গিত দিচ্ছে না? সাংগঠনিকভাবে দলকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে হেফাজত আর জামায়াতকে রুখতে। আর সরকারের মধ্যে বোঝাবুঝিটা আরো পরিষ্কার এবং প্রানবন্ত করতে হবে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি খেলা খেলে কারোরই শেষ রক্ষা হবে না। রাজাকার মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার যে লড়াইয়ে আমরা নেমেছি এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। আমাদের পিছনে ফেরার আর কোন সুযোগ নেই। ভুল বুঝাবুঝি মান-অভিমান ভুলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ একাত্তরের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার।

২.

গত ২০ মার্চে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর এখন সে পদটি শূন্য - অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন স্পীকার আবদুল হামিদ। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির এ দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার সাংবিধানিক যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সে হিসেবে ১৮ জুনের

মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। কে হবেন নতুন রাষ্ট্রপতি তা নিয়ে চলছে নানান বিশ্লেষণ ও আলোচনা। হরতালের ডামাডোলে আর রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কারণে গুঞ্জন হলেও এখনও বিষয়টি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি।

রাষ্ট্রপতি পদটি যদিও সাংবিধানিকভাবে ফিতাকাটা আর বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করার মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে এই পদটি গোটা দেশের এক নম্বর গুরত্বপূর্ন পদ হয়ে দাঁড়ায় যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা দেশের জরুরী অবস্থাতে। ক্ষমতাসীনরা সব সময়েই চেষ্টা করেন তাদের দলের প্রতি অনুগত কাওকে রাষ্ট্রপতি করতে যাতে সমঝোতার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা সহজ হয়। যদি সরকার একদলের আর রাষ্ট্রপতি অন্য দলের সমর্থক হন তবে বঙ্গভবন আর গণভবনের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ শুরু হয়ে যায়। সেজন্যেই রাষ্ট্রপতি হতে হবে এমন একজনকে যিনি হবেন রাষ্ট্রের নাম্বার ওয়ান অভিবাবক। সর্বজন স্বীকৃত গ্রহণযোগ্য এবং মোটমুটিভাবে নিরপেক্ষ। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান তাই-ই ছিলেন যার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর মৃত্যুর পর। বিরোধী দলীয় প্রধান থেকে শুরু করে দেশের সকল রাজনীতিবিদ এবং আপামর জনসাধারণ তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছেন - মন খারাপ করেছেন। শোকার্ত হয়েছেন। সকলেই একবাক্যে বলেছেন তাঁর এই সময়ে চলে যাওয়াটা দেশের জন্য বিশাল ক্ষতি হয়ে গেলো। কেন বললেন এ কথা? কারণ এখন যে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংকট এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দল গুলোকে এক জায়গায় বসানো। আদালতও সে কথাই বলছে রুল জারি করে। এবং সেটা একমাত্র পারতেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। কারণ তাঁর প্রতি সবার সে আস্থা ছিলো। সেটা তাঁর ব্যক্তিত্ত্বের কারণে।

সে জন্যেই বর্তমানের কঠিন সময়ে তেমনি একজন রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করবেন। আর সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করবেন। সংবিধানের ওই বিধান অনুযায়ী ভোটার তালিকাও প্রণয়ন করবেন নির্বাচন কমিশন। সংসদ সদস্যরাই হবেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটার।

তাহলে কে হতে পারেন রাষ্ট্রপতি? গুজবের ডালপালা শাখা প্রশাখা এর মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে অনেকটাই। সে আলোচনায় যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক জন্ম থেকে এ অবধি কারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন? তাঁরা হলেন –(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২। (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ৯ জানুয়ারি ১৯৭২। (৩) আবু সাঈদ চৌধুরী- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩। (৪) মোহাম্মদ উল্লাহ- ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। (৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭৫। (৬) খন্দকার মোশতাক আহমদ- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৭৫। (৭) এস এম সায়েম- ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৭৬। (৮) জিয়াউর রহমান- ২১ এপ্রিল ১৯৭৬ থেকে ২৯ মে ১৯৮১। (৯) আবদুস সাত্তার (ভারপ্রাপ্ত)- ৩০ মে ১৯৮১ থেকে ১৯ নভেম্বর ১৯৮১। (১০) আবদুস সাত্তার- ২০ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২৩ মার্চ ১৯৮২। (১১) এএফএম আহসান উদ্দিন চৌধুরী- ২৭ মার্চ ১৯৮২ থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৩। (১২) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ- ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। (১৩) সাহাবুদ্দীন আহাম্মদ (অস্থায়ী)- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৯১। (১৪) আবদুর রহমান বিশ্বাস- ৯ অক্টোবর ১৯৯১

থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৯৬। (১৫) সাহাবুদ্দীন আহাম্মদ- ৯ অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০১। (১৬) একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী- ১৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২১ জুন ২০০২। (১৭) মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সরকার (দায়িত্বপ্রাপ্ত)- ২১ জুন ২০০২ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২। (১৮) অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ- ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯। (১৯) মোঃ জিল্লুর রহমান ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০ মার্চ্চ ২০১৩। এ তালিকা দেখে একটা ধারণা করা যায় কে কেমন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং কার কখন কী ভুমিকা ছিলো। সেই হিসেবনিকেশ মাথায় রেখেই নির্বাচন করতে হবে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি।

আলোচনায় আছে বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের স্পিকার আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেট কিংবা সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী বা আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় কোন নেতা পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। আলোচনায় আরো আছে সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের নাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের ব্যাপারে আগ্রহী। তাঁর সাহসিকতা, সততা, বিচার বিভাগে তাঁর ভূমিকা সব মিলিয়েই এ আগ্রহ। তবে দলীয় লোক না হওয়ায় দলের কথা মতো নাও চলতে পারেন তিনি এবং তাঁর মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট করা হলে তিনি যেটা ন্যায়সঙ্গত ও আইনসম্মত সেটাই করতে সচেষ্ট হবেন– এ কারণে দলের কেউ কেউ তার ব্যাপারে বিরোধীতাও করছেন। তবে বিরোধী দল কোন অবস্থাতেই তাঁকে মেনে নেবে না কারণ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে রায়, সপ্তম সংশোধনী নিয়ে রায় ও ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে রায় তিনিই দিয়েছেন। পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের ব্যাপারে সরকারের আগ্রহের মূল কারণ হচ্ছে, তিনি অন্য আর দশজন আওয়ামী লীগ নেতার মতো কট্টর আওয়ামী লীগার নন। তিনি সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তিনি বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান হওয়ার কারণে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করা হলে তিনি আগামী দিনে ওয়ান ইলেভেন কিংবা সেনা শাসনের মতো কোনো পরিস্থিতি হলে তা প্রতিহত করবেন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। সেইসঙ্গে তিনি একজন মু ক্তিযোদ্ধা। এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে সোহরোয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে তিনিই মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বর্তমানে তিনি সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সভাপতি এবং যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবির একজন অগ্রসৈনিক। তাঁর কারণে সরকারের পক্ষে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের যে বিচার কাজ শুরু করেছে সেই বিচার কাজ সম্পন্ন করা ও রায় কার্যকর করা সহজ হবে। তিনি কোনো সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমা করবেন না।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়টি হলো, শোনা যাচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আশরাফুল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রী করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের চিন্তা ভাবনাও নাকি আছে কারো কারো মাথায়। এছাড়া এর আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুঞ্জন ছিল, বর্তমান মেয়াদেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি পদে গিয়ে তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে পারেন। আমার মনে হয় এ দু'টোই হবে আত্মঘাতী উদ্যোগ। ধরে নেয়া যাক শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি হলেন কিন্তু নির্বাচন তো দিতেই হবে। এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য। ওদিকে আগামী নির্বাচনে যদি

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় না আসতে পারে তখন কী বিএনপি সরকার এ রাষ্ট্রপতিকে রাখবে? অবশ্যই না। তখন রাষ্ট্রপতিকে সরানোর একটাই পথ হবে ইমপিচমেন্ট। সেটা কী খুব সম্মানের ও সুখের হবে? কথা প্রসঙ্গে বলছি গত টার্মে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কন্যাকে গণভবন দান করে দিয়েছিলেন (হাসবো না কাঁদবো!) পরে কী সেটা রাখতে পেরেছিলেন না রেখেছেন? তেমনি ছোট বোন কী ধানমন্ডির বাড়ীটি রাখতে পেরেছেন? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে কার কী লাভ হয়েছিলো?

সামনের দিন বড় কঠিন দিন তাই বলি খুব চিন্তা ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। এ সরকারই পেরেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করতে এবং এরাই পারবে বিচারের রায় কার্যকর করতে। ফলে কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন এই সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারে। সে জন্যেই আত্মঘাতী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি করা উচিৎ পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে। কারণ তিনিই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে সোহরোয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হলে সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধীদের যে বিচার কাজ শুরু করেছে ওই বিচার কাজ সম্পন্ন করা ও রায় কার্যকর করা সহজ হবে। তিনি কোন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া অন্যদের তুলনায় তিনি অধিক গ্রহণযোগ্যতা পাবেন বিরোধীসহ সকল মহলে। সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলে বিএনপি কিছুতেই মেনে নেবে না এবং ক্ষমতার বদলে তাঁরও ইমপিচমেন্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সে হিসেবে বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেট বিএনপির কাছে তথা সব দলের কাছে 'মন্দের ভালো' হিসেবে বিবেচিত। এমন কী খোয়াবরত এরশাদও এখন বলছেন তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেটকেই সমর্থন দেবেন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য। শোনা যায় সরকার এপ্রিল মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ করতে চায় ফলে সময় বেশী নেই। একটা গানের কথা মনে হলো - 'সময় বলছে দেখো ঠিক্ ঠিক্/সময় ঘড়ি চলছে টিক্ টিক্/এখনই করতে হবে মনস্থির/ কোন পথ হবে যে সঠিক'। জামাত-শিবির এবং বিরোধীরা সব ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকারে উন্মত্ত। সেই ঘোলাপানি সামলাতে গিয়ে তাই সরকারের কোন ভুল করা চলবে না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভুল মানেই আত্মঘাত। এবং তা সবার জন্যই।

দেশের স্বার্থে দেশের ভবিষ্যতের কঠিন দিনগুলির কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার অথবা বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং স্পীকার আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেটের কথা ভাবা সমীচীন হবে। যদিও এ দু'জনকে নিয়েও টুকটাক বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে তথাপি কোন শতভাগ নিষ্কলুষ প্রার্থী পাওয়া যাবে না বিধায় এঁদের দুজনার মাঝ থেকে একজনকেই বেছে নিতে হবে যা দেশের জন্য এবং সকলের জন্যই মঙ্গল। সামনে দিন বড় কঠিন।